BEGALI (PG) SEM-II Paper-204(CBCS)

চর্যাপদের আবিস্কার, আবিস্কারক, নামকরণ, রচনাকাল ও রচয়িতাগণ

আবিস্কার ও আবিস্কারক- **চর্যাপদ** বাংলা ভাষার প্রাচীনতম পদ সংকলন সাহিত্যিক নিদর্শন এবং ভাষা নিদর্শন। অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে এই পদ গুলি রচিত হয়। এবং গীতিপদাবলির রচয়িতারা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ় অর্থ সাংকেতিক রূপের আশ্রয়ে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই তাঁরা পদগুলো রচনা করেছিলেন। চর্যাপদ ধর্মগ্রন্থজাতীয় রচনা হলেও সমকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলি এই পদগুলোতে উজ্জ্বল। এর সাহিত্যগুণ এখনও চিত্তাকর্ষক। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা বা লাইব্রেরী থেকে চর্যার একটি খণ্ডিত পুঁথি উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চর্যাপদের সঙ্গে বাংলা ভাষার অনস্বীকার্য যোগসূত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ সালে নেপালে রক্ষিত বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য প্রথমবার নেপাল ভ্রমণ করেন। ১৮৯৮ সালের তার দ্বিতীয়বার নেপাল ভ্রমণের সময় তিনি কিছু বৌদ্ধ ধর্মীয় পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার নেপাল ভ্রমণকালে *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়* নামক একটি পুঁথি নেপাল রাজদরবারের অভিলিপিশালায় আবিষ্কার করেন। *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়,* সরহপাদের দোহা এবং অদ্বয় বজ্রের সংস্কৃত *সহজাম্নায় পঞ্জিকা,* কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদের দোহা, আচার্যপাদের সংস্কৃত *মেখলা* নামক টীকা ও আগেই আবিষ্কৃত *ডাকার্ণব* পুঁথি একত্রে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (শ্রাবণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধগান ও দোঁহা* শিরোনামে সম্পাদকীয় ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মোট ৪৬টি পূর্ণাঙ্গ ও একটি খণ্ডিত পদ পেয়েছিলেন। পুঁথিটির মধ্যে কয়েকটি পাতা ছেঁড়া ছিল। প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যার যে তিব্বতি অনুবাদ সংগ্রহ করেন তাতে আরও চারটি পদের অনুবাদসহ ওই খণ্ডপদটির অনুবাদও পাওয়া যায়। মূল পুঁথির পদের সংখ্যা ছিল ৫১। মূল তিব্বতি অনুবাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মূল পুঁথির নাম *চর্যাগীতিকোষ* এবং এতে ১০০টি পদ ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিটি *চর্যাগীতিকোষ* থেকে নির্বাচিত পুঁথিসমূহের সমূল টীকাভাষ্য। প্রাপ্ত চর্যার পুঁথিটি তালপাতায় লেখা। এক-একটি পৃষ্ঠায় পাঁচটি করে পংক্তি। প্রতি পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাতার সংখ্যা দেওয়া আছে।

নামকরণ- আবিস্কৃত গ্রন্থটির নামকরণ নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। কারণ গ্রন্থটির সামনের ও পিছনের পাতাগুলি আবিস্কৃত না হওয়ায় আসল নাম জানা যায় না। শাস্ত্রীমহাশয় 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটি গ্রহণ করে গ্রন্থের সম্পাদনায় এই নামটিই ব্যবহার করেছেন, সংক্ষেপে এটি ‘বৌদ্ধগান ও দোহা’ বা ‘চর্যাপদ’ নামেও অভিহিত হয়ে থাকে কিন্তু আবিষ্কৃত পুঁথিটি যেহেতু মূল পুঁথি নয়, মূল পুঁথির নকলমাত্র এবং মূল পুঁথিটি (তিব্বতি পুঁথি) যেহেতু এপর্যন্ত অনাবিষ্কৃত, সেই কারণে পরবর্তীকালে চর্যা-পদাবলির প্রকৃত নাম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ১৯৩৮ সালে প্রবোধ চন্দ্র বাগচী আই. পি কডিয়ার প্রকাশিত তেঙ্গুর পুস্তক তালিকায় এই বই এর পূর্নাঙ্গ তিব্বতী অনুবাদের সন্ধান পান। সেখান থেকে জানা যায় পন্ডিতবর্গ ‘চর্যাগীতিকোষ’ নামে একশত সিদ্ধবজ্রগীতের এক সংকলন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মুনিদত্ত তার অর্ধেক অর্থাৎ

৫০টি বিবৃত করেন। এবং একটি টীকা গ্রন্থ রচনা করেন। টীকার নাম 'নির্মলগীরা'। বিধুশেখর শাস্ত্রী 'নির্মলগীরা'র বস্তু-নির্দেশক শ্লোকের সূত্র ধরে বলেছেন গ্রন্থটির সঠিক নাম 'আশ্চর্যচর্যাচয়'। সুকুমার সেন নামকরণ করেন 'চর্যাগীতি পদাবলী'। গীত সঞ্চয়নের দিক থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন 'গানের নাম চর্যাপদ'। কিন্তু পদ শব্দটি ব্যবহৃত হত দুই পঙতির একটি শ্লোক এর ক্ষেত্রে। চর্যার টীকায় প্রতিটি গানের ব্যাখ্যায়, এই অর্থেই পদ শব্দটি ব্যবহৃত। সুতরাং পদসমষ্টির সংকলনের দিক থেকে গীতসংকলনের নাম 'চর্যাপদাবলী' হতে পারে না। যুক্তি প্রতিযুক্তি বা বির্তকের মধ্যে চর্যার নামকরণ বিষয়ে কোন সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে আবিস্কৃত সংকলনটি 'চর্যাপদ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

রচনাকাল-চর্যার নামকরণের মত রচনাকাল নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে চর্যার পদগুলি খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই সময়কালকে আরও ২০০ বছর পিছিয়ে দিয়ে চর্যার রচনাকাল খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বলে মতপ্রকাশ করেছেন। উভয়ে চর্যাগীতিকারদের কালনিরূপণে তিব্বতী বিবরণের ওপর নির্ভর করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে লুইপাদ দশম শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান থাকবেন। অপরদিকে তিব্বতি কিংবদন্তী অনুসারে তিনিই সিদ্ধাচার্যদের আদিগুরু; অর্থাৎ, চর্যার সময়কালও দশম শতাব্দীর পূর্বে হতে পারে না।

এইসব তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে চর্যার পদগুলি খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বলেই অনুমিত হয়। তবে তার পরেও দু-তিনশো বছর ধরে গোপনে চর্যাগীতি রচিত হয়েছিল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত নেপাল ও তরাই অঞ্চল থেকে এই ধরনের শতাধিক পদ উদ্ধার করেছেন ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। এগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *নব চর্যাপদ* নামে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়।

রচয়িতা বা কবিগণ- আবিষ্কৃত 'চর্যাপদ' পুঁথিটিতে ৫০টি চর্যায় মোট ২৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায়। এঁরা মধ্যে কয়েকজন হলেন-
লুইপা, কুক্কুরীপা, চাটিলপা, ভুসুকুপা, কাহ্নপা, ডোম্বীপা, সরহপা, শবরপা, ঢেণ্ঢণপা, এই নামগুলির অধিকাংশই তাঁদের ছদ্মনাম এবং ভনিতার শেষে তাঁরা নামের সঙ্গে 'পা' শব্দটি সম্ভ্রমবাচক অর্থে ব্যবহার করতেন। চর্যার কবিগণ *সিদ্ধাচার্য* নামে পরিচিত। সাধারণত বজ্রযানী ও সহজযানী আচার্যগণই এই নামে অভিহিত হতেন। তিব্বতি ও ভারতীয় কিংবদন্তিতে এরাই 'চৌরাশি সিদ্ধা' নামে পরিচিত। তবে এই ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য আসলে কারা ছিলেন তা সঠিক জানা যায় নি। সাধারণভাবে লুইপাদকেই আদি সিদ্ধাচার্য মনে করা হয়। তাঞ্জর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন বাঙালি। ১ ও ২৯ সংখ্যক পদদুটি তাঁর রচিত।চর্যার পুঁথিতে সর্বাধিক সংখ্যক পদের রচয়িতা কাহ্ন বা কাহ্নপাদ। তিনি কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণপাদ ও কৃষ্ণবজ্র নামেও পরিচিত। তাঁর রচিত পদের সংখ্যা ১৩টি।

সূত্র: ইন্টারনেট